The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-6 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

সমাজবদ্ধ জীবন উন্নয়নে সামাজিক স্তরবিন্যাস : প্রসঙ্গ বরেন্দ্র অঞ্চল
[Social Stratification and the Development of Communal Life: A Study of the Barind Region]

Dr. M. Khalilur Rahman
Professor, Department of Islamic History & Culture, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-6
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 27 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Barind, Region, Stratification, Cultural Architectural Heritage, Historical Janapadas

ABSTRACT

Barind (Varendra) occupies a unique place in the historicity of ancient Janapadas. Its connection with the ancient history of Bengal is deeply connected and related. The name of Varendra is traced towards the ninth and tenth centuries Christian era. The region is composed of ancient Maldah, Rajshai, Bogra, Dinajpur and Rangpur. Before the Muslim conquest the aborigin or tribal people were the-deviser or contriver of society, literature and culture of this region. Subsequently, though the influence of the Hindu culture was extended, but with the passage of time Muslim culture became dominant. The present paper is a humble attempt to highlight the influence of Vedic, Mythological, Brahmanic, Budhist and Jaino religious cults on the religious rituals of the people of the area, the nature of social life of the people of the area, the prestige of the women in society, economic conditions along with the ways of life style and livelihood-over the years under study. In addition, some architectural features of Mahasthan and Paharpur along with paintings of the area have been mantioned in the concluding remarks under study in the article

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। আর এ সমাজবদ্ধ জীবন ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। তবে সমাজে সমতা-অসমতা চিরাচরিত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। সব সমাজেই অসমতা বিদ্যমান। সমাজে অসমতা তৈরি হয় ক্ষমতা, মর্যাদা ও বিত্তের ভিত্তিতে। আর এ অসমতার পরিলক্ষিত রূপ হলো সামাজিক স্তরবিন্যাস। স্তরবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে অসমতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মাসুষের মধ্যে ক্রমশঃ স্তর সৃষ্টি করে। প্রাচীনত্ব, সর্বব্যাপিতা, সামাজিকভাবে বিন্যাস্ততা, বহুরূপীতা, সুদূর প্রসারী প্রভাব প্রভৃতি হলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সমাজভেদে স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। বরেন্দ্র অঞ্চলের শিকার ও সংগ্রহ সমাজ, উদ্যান-কৃষি সমাজ, কৃষি সমাজ এবং শিল্প সমাজে স্তরেবিন্যাসের ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। প্রাচীন জনপদসমূহের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত নাম বরেন্দ্র। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের সাথে এর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট ও নিবিড়। খ্রিষ্টীয় নবম বা দশম শতকের দিকে বরেন্দ্র নামের সন্ধান পাওয়া যায়। আর অত্র অঞ্চলে প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত সামাজিক স্তরবিনাসের বিভিন্ন ধরণ দেখা যায়। এর মধ্যে চারটি ধরণ হলো: জাত-বর্ণ প্রথা, দাস প্রথা, এস্টেট ব্যবস্থা ও শ্রেণি। স্তরবিন্যাসের একটি প্রচীনতম ধরণ হলো জাত-বর্ণ প্রথা যা বরেন্দ্র অঞ্চলে হিন্দু ধর্মে লক্ষণীয়।

বরেন্দ্র নামের পটভূমি

বরেন্দ্র নামকরণের ক্ষেত্রে ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রদেবের বর হিসেবে কোনো অঞ্চলের নাম যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অথবা এক শ্রেণির ব্রাক্ষণের নাম অনুসারে এর নাম বরেন্দ্র হওয়াও সমীচীন নয়।[১] বরং বরেন্দ্র অঞ্চলে বাস করার জন্য যে কোনো ব্রাক্ষণকে বরেন্দ্রী ব্রাক্ষণ বলা হয়ে থাকে।[২] যেমনভাবে রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী ব্রাক্ষণকে রাঢ়ী ব্রাক্ষণ বলা হয়ে থাকে।[৩] বার ভুঁইয়াদের বসবাস হিসেবে অত্র অঞ্চলে বিখ্যাত বলে কেউ কেউ এ অঞ্চলকে বরেন্দ্র বলেছেন।[৪] তাবাকাত-ই-নাসিরীর অনুবাদক ও টীকাকার র‍্যাভারটি সাহেব সংস্কৃত শব্দ 'ব্রীন্দ' হতে বরেন্দ্রের উৎপত্তি হওয়ার স্বপক্ষে মত পেশ করেছেন।[৫] 'ব্রীন্দ' শব্দের অর্থ উচু। কাজেই বরেন্দ্র বলতে উঁচু স্থানকে বুঝানো হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের ব্যবহৃত 'বারিন্দাহ' বা 'বরিন্দ' শব্দ তাঁদের সমার্থজ্ঞাপক বলে মনে হয়। তাদের ব্যবহৃত শব্দ 'বরিন্দ' আরবি 'বাররুন বা বাররীন' শব্দের অপভ্রংশ না হওয়ার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই বরং সে ক্ষেত্রে শব্দগত দিক থেকে এর সমর্থন হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।[৬] সাধারণ লোকের কাছে বরেন্দ্র শব্দটি 'বরিন' হিসেবে অধিক পরিচিত। বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হতে তুলনামূলকভাবে এ অঞ্চলটি শুষ্ক ও উঁচু। অধুনা আবিষ্কৃত আরবি শিলালিপিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।[৭]

বরেন্দ্র নামের উৎপত্তি সম্পর্কে শব্দগত মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এতে কোনো সন্দেহ নাই যে, বরেন্দ্র বা বারিনদের প্রাচীনত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তার ইতিহাস ও সংস্কৃতি অতি সমৃদ্ধ। বরেন্দ্রের সীমানা ও বিস্তৃতি নির্ধারণ করতে পারলে ইতিহাসের তার স্থান নির্ণয় এবং গুরুত্ব পর্যালোচনা করা অনেকটাই সহজ হবে। সন্ধাকর নন্দী করতোয়া ও গঙ্গা (পদ্মা) নদীর মধ্যবর্তী স্থানে বরেন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করেছেন।[৮] মিন্হাজ উস-সিরাজ তাকে লখনাবতী সম্রাজ্যের একটি অংশ হিসেবে এবং গঙ্গার পূর্ব তীরের অঞ্চল হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৯] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'গঙ্গা নদীর উত্তরাঞ্চলে বরেন্দ্রভূমি অবস্থিত। এ অঞ্চলটি মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও রংপুর নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলটি পূর্বে আমাদের পার্বত্যমালায় গিয়ে মিলেছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বরেন্দ্রভূমি ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ অঞ্চলের মাটি গৈরিক, স্থুল ও বালুকাময়। সমতল ভূমির তুলনায় উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলটি সম্ভবত হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বারিপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-প্রকৃতির গঠন দেখে ধারণা করা যায় যে, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর স্পর্শ করে এ মালভূমির রেখা স্ফীত হয়ে গোয়ালপাড়া ও কামরুপ পর্যন্ত বিস্তৃত।[১০] সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'বারিন্দ্রের গৈরিক ভূমি অনুর্বর পরাভূমি। এর পূর্ব-পশ্চিমে দক্ষিণ ঘিরে তাঙ্গন, আত্রাই, মহানন্দা, পদ্মা, করতোয়া নদী প্রবাহিত এবং এদের দ্বারা গঠিত সমতলভূতি বরেন্দ্র পুন্ড্রবর্ধনের একটি বড় অংশ। অনেক সময় বরেন্দ্র বলতে পুন্ড্রবর্ধনকে বুঝাতো। বরেন্দ্র ভূমির সাথে রাঢ় ভূমির বিশেষত মুর্শিদাবাদ, বীরভূমি ও বর্ধমানের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল।'

স্তরবিন্যাসের সর্বব্যাপিতা

স্তরবিন্যাসের সমগ্র বিশ্বজোড়া রূপে ধনী-দরিদ্র, শক্তিমান, দুর্বল, মর্যাদাবান ও মর্যাদাহীনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক দেশেই এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশেও স্তরায়ন রয়েছে। অনক্ষর সমাজেও স্তরবিন্যাস উপস্থিত রয়েছে। সামাজিকভাবে নির্দেশিত অসাম্য নারী-পুরুষ, প্রাপ্ত-বয়স্ক ও শিশুর মধ্যেও রয়েছে। বয়স ও লিঙ্গ ছাড়াও ক্ষমতা, সম্পত্তি ও মর্যাদার মত মানদন্ডের উপর স্তরবিন্যাসের সর্বজনীন কাঠামো নির্ভর করে।[১১]

স্তরবিন্যাসের সামাজিক ধরন

বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষের দৈহিক এবং বুদ্ধিমত্তার ভিন্নতা অসমতা সৃষ্টির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, অসমতার যথার্থ রূপ আমরা দেখতে পাই সমাজে যেভাবে মানুষ ক্ষমতা, বিত্ত ও মর্যাদার ভিত্তিতে ক্রমোচ্চভাবে সজ্জিত হয় তার মধ্যে অসমতা এবং স্তরবিন্যাস পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সমাজের মূল্যবোধ এবং শ্রেয়োবোধ সামাজিক পুরস্কারকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজে যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা প্রথা, নিয়ম এবং আইনের মাধ্যমে অসমতাকে টিকিয়ে রাখতে বা বৃদ্ধি করতে পারে। অসমতা ও স্তরবিন্যাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয়। জাত-বর্ণ প্রথায় ব্রাহ্মণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্রাহ্মণ থেকে যায়। সমাজে যারা ধনী এবং ক্ষমতাবান তারা তাদের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণিগত অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারে। বহুরূপীতা সামাজিক অসমতা ও স্তরবিন্যাসের রূপ কাল এবং স্থান ভেদে বিভিন্ন হয়।[১২]

সমাজবিজ্ঞানী গেরহার্ড লেনস্কী Gerhard Lenski বিভিন্ন সমাজে স্তরবিন্যাসের রূপ তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শিকার এবং সংগ্রহ সমাজে অসমতা সবচেয়ে কম। এই ধরনের সমাজে কাজের বিভাজন হয় বয়সের ভিত্তিতে। মর্যাদার ভিত্তিতে অসমতা নিরূপিত হয়-যেমনটি ঘটে পাপুয়া নিউগিনির কিইওয়াই উপজাতির মধ্যে।[১৩]

উদ্যান-কৃষি সমাজ

বরেন্দ্র অঞ্চলে এই ধরনের সমাজে অসমতা কিছুটা বেশি। মর্যাদার ভিত্তিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি হয়ে যায়। এরা হচ্ছে বিগম্যান বা গোষ্ঠীপতি। এদের উৎপাদনের উপায় বা অন্যের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জমির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে গোত্রের। অতিরিক্ত খাদ্য সবার মধ্যে পুনরায় বিতরণ করা হয়। তবে বিতরণে অসমতা লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

কৃষি সমাজ

অসমতা তীব্রতম হচ্ছে কৃষি সমাজে। সম্রাট, রাজা, পুরোহিত, সামন্তপ্রভু এবং আমলাতন্ত্র কৃষি সমাজে যে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে তা আত্মসাৎ করে। শাসক শ্রেণির হাতে থাকে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। ভূমিদাস এবং দাসত্ব প্রথাও এই সমাজে বিরাজ করে। কৃষি সমাজে স্তরবিন্যাসের তারতম্য ব্যাপক। ইউরোপের সামন্ততন্ত্র, ভারতের কৃষি সমাজ বা আফ্রিকার কৃষি সমাজ সহজে তুলনীয় নয়।[১৫]

শিল্প সমাজ

শিল্প সমাজে অসমতা কমে আসে। এর প্রধান কারণ শিল্প সমাজে রাজনৈতিক সমতা তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসমতা জটিল রূপ গ্রহণ করে। সাধারণভাবে মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়। সামাজিক সচলতা ব্যাপক, যদিও তা বর্ণ, ধর্ম এবং লিঙ্গের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। স্তরবিন্যাসের ফলাফল প্রধানত: চারটি ক্ষেত্রে দেখা যায়-জীবন সম্ভাবনা, প্রতিষ্ঠান, জীবনযাত্রা এবং মূল্যবোধ। সমাজের প্রতিটি স্তরের জীবন সম্ভাবনা ভিন্ন থাকে। শ্রমিক শ্রেণির ছেলে বা মেয়ের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বা উঁচু প্রশাসনে যাওয়া সহজ নয়। এর কারণ সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ শ্রেণিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। শ্রমিক শ্রেণির পরিবার এবং পারিবারিক মূল্যবোধ মধ্যশ্রেণীর পরিবার এবং পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে

ভিন্ন। প্রতিটি শ্রেণির জীবনযাত্রা Life Style ভিন্ন। তবে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীরা অসমতার তিনটি ফলাফলের দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন- যা হল দারিদ্র্য, বঞ্চনা এবং ক্ষমতাহীনতা।[১৬]

সমাজ জীবনে সমাজ কাঠামো সামাজিক স্তরবিন্যাস ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা

জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস এর মতানুসারে- অর্থনীতির মানদণ্ডে সমাজের মানুষের যে ভেদাভেদ সেটাই সামাজিক স্বরবিন্যাস অথবা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ সেটাই সামাজিক স্তরবিন্যাস।" আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী মেরিল তার Society and Culture গ্রন্থে সামাজিক স্বরবিন্যাসের সংজ্ঞায় বলেন, "কোনা গোষ্ঠী যদি অন্যদের তুলনায় ভালো সুযোগ-সুবিধায় চাকরি, ক্ষমতা ইত্যাদি বেশি মাত্রায় ভোগ করে, তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস।[১৭]

উপরের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সমাজে বিদ্যমান জনসংখ্যাকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা যায়। সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো সমাজের ভেদাভেদের চিত্র। সমাজের বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের সাথে মানুষের যে পার্থক্য মূলত তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নলিখিত রূপ উল্লেখ করা হলো:

১. সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক ব্যাপার, প্রাকৃতিক নয়।
২. সকল সমাজেই স্বরবিন্যাস লক্ষ করা যায় যদিও এর ধরন সমাজ ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে।
৩. স্তরবিন্যাস বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে।
৪. সংস্কৃতি স্তরবিন্যাসকে প্রতিফলিত করে।
৫. স্তরবিন্যাসকে একটি সর্বজনীন ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
৬. সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক মান ও রীতির নিয়ামক।[১৮]

সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসের পারস্পরিক সম্পর্ক

সমাজ কাঠামো বলতে সমাজের গঠন প্রণালিকে বোঝায়। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন দল ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে সম্পর্কসহ সব ধরনের সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠে। রাডক্লিপ ব্রাউন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ককেই সমাজ কাঠামো বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে জিন্সবার্গ বলেন, সমাজ কাঠামো হলো সমাজকে রূপায়ণ করে এমন প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের যৌগিক সমন্বয়। মূলত সমাজ কাঠামো হলো সামাজিক সম্পর্কের সমন্বিত রূপ।[১৯]

পক্ষান্তরে সামাজিক এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অর্থ, সম্পদ, মেধা, বংশ, শিক্ষা, বয়স, পেশা, লিঙ্গ, ক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে সমাজের বিদ্যমান জনসংখ্যাকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়। জন্মসূত্রে সকল মানুষ সমান এমন মানবতাবাদী দর্শন পৃথিবীতে চালু থাকলেও বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন কোন সমাজ পাওয়া যাবেনা যেখানে মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই। সামাজিক স্তরবিন্যাস সর্বজনীন। সব যুগে সব কালে সব সমাজই স্তরায়িত। নিম্নে সমাজ কাঠামো এবং সমাজ স্তরবিন্যাসের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো হলো:

জীবনযাত্রার মান: জীবনধারার পরিবর্তনের কারণেই সমাজে সামাজিক গতিশীলতার গতি অব্যাহত থাকে। বস্তুত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে সামাজিক গতিশীলতার মূল কারণ। তবে সমাজজীবন বহির্ভূত উপাদান বা কারণসমূহের কার্যকারিতাও এ ক্ষেত্রে কম-বেশি থাকে।[২০]

কাজের সামর্থ্য: অনেক সময় দেখা যায়, উচ্চস্তরের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে নানা কারণে সংশ্লিষ্ট স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজকর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম বা সফল হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের সামাজিক মান মর্যাদার হানি ঘটে এবং তারা সামাজিক গতিশীলতার নিম্নস্তরে অবনমিত হয়।[২১]

জীবন যাপন রীতি: সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের মানুষ অপেক্ষাকৃত উঁচু স্বরে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে উচ্চতর স্বরভুক্ত ব্যক্তিবর্গের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রভৃতি জীবন যাপনের রীতি অনুকরণে আগ্রহী হতে পারে। এভাবে সৃষ্টি হয় উর্ধ্বমুখী উলম্ব গতিশীলতা। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে। যেমন: সমাজের উঁচু স্বরে অবস্থিত ব্যক্তিবর্গ যদি সেই স্তরের আচার আচরণ থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে সামাজিক মর্যাদার হানি ঘটে এবং এরকম ক্ষেত্রে অধাতেমুখী সামাজিক গতিশীলতার জন্ম দেয়।[২২]

শ্রমবিভাগের মাত্রা: কোনো জাতি বা গাষ্ঠীতে শ্রম বিভাজনের মাত্রা সামাজিক গতিশীলতাকেও প্রভাবিত করে থাকে। শ্রম বিভাজন যদি উন্নত মানের হয়, তাহলে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে গমনের সুবিধা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার যে সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে অনুসৃত হয় এবং প্রতিটি জাতির জন্য ঐতিহ্যগত পেশা নির্দিষ্ট থাকে, সেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থার অস্তিত্ব সত্ত্বেও সামাজিক গতিশীলতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।[২৩]

সামাজিক পরিবর্তনের হার: বিপ্লবের মতো দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান উলম্ব সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। বিপরীত দিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সুযাগে যেখানে কম, সেখানে সামাজিক গতিশীলতার সম্ভাবনাও কম। অর্থনৈতিক বিকাশ ও বিস্তার।[২৪]

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সদস্য হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির কতকগুলাতে ভূমিকা ও কর্তব্য থাকে । সমাজে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলে বিধায় সামাজিক ভারসাম্য বা সামাজিক সংহতি রক্ষা সম্ভব হয়। কিন্তু ব্যক্তি সব সময় সামাজিক নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত হয় না বা সব সময় যুক্তিযুক্তভাবে আচরণ করে। ফলে সমাজ ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরাপে করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় আচরণ করতে বাধ্য করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার এ প্রক্রিয়াকে সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।[২৫]

বস্তুত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজ ব্যক্তিকে সমাজ স্বীকৃত রীতি নীতির মাধ্যমে আচরণ করতে বাধ্য করে এবং তাকে সমাজে বসবাস করার উপযুক্ত করে তোলে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, “By social control is meant the way in which the entire social order coheres and maintains itself, how it operates as a whole, as a changing equilibrium.” অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে এমন একটি পন্থাকে বুঝায় যার মাধ্যমে সমাজের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে ও নিজেকে বজায় রাখে এবং সামগ্রিকভাবে একটি পরিবর্তনশীল ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারে।[২৬] হাঙ্গেরিয়ান সমাজবিজ্ঞানী কারল ম্যানহেইম সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।[২৭] যথা:

ক. প্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: এ ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন পুলিশ, আদালত ও জেলখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ. পরাক্ষে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: পরাক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা হয়ে থাকে। তাই পরাক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে।

আমেরিকান সমাজ মনোবিজ্ঞানী কিম্বল ইয়ং ব্যবহারিক দিক থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।[২৮] যথা :

ইতিবাচক নিয়ন্ত্রণ: সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুরস্কার, সুপারিশ, উপদেশ, স্নেহ মমতা ও মিলন ইত্যাদি কৌশলকে কাজে লাগানো হয়। এ সকল কৌশল ইতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণ: জেল, হুমকি, জুলুম, বাধ্যবাধকতা, শক্তি, নির্দেশ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা হলো নেতিবাচক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

এছাড়া আরো কয়েক প্রকারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন-

আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সৃষ্ট আইন কানুন, সরকার ইত্যাদি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: কতগুলো বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, লোকাচার, লোকরীতি ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণকে অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমাজস্থ ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণকে উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।

সহজাত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সহজাত গুণ যেমন: অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা, বিপদের সময় সহানুভূতি, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, ন্যায়ের প্রতি আগ্রহ, সত্যের প্রতি সমর্থন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করাকে সহজাত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে।[২৯]

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাহনসমূহ

সমাজ জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে শৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মেটাতেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিটি সমাজে প্রচলিত থাকে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মূলত দুটি মাধ্যমে তথা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে হতে পারে। সামাজিক ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি নীতি মূল্যবোধ, লোকাচার ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক বিষয়গুলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আদিম ও ঐতিহ্যবাহী সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের

ক্ষেত্রে এ মাধ্যমের গুরুত্ব সর্বাধিক। অপরপক্ষে বিধিবদ্ধ আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্যা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। সাধারণত অগ্রসরমান আধুনিক সমাজে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এটি বেশি গুরুত্বহ।[৩০]

পরিবার

সমাজ নিয়ন্ত্রণের প্রথম মাধ্যম হলো পরিবার। আর এ পবিবারের মাধ্যমেই সমাজের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিল্পকলা ও সাহিত্য, শিল্পকলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিল্পী যেমন সমাজ জীবনের নানাদিক তুলে ধরেন, তেমনি সংগীতের মাধ্যমে সামাজিক নানা অসঙ্গতিকে তুলে ধরা সম্ভব। ফলে শিল্পকলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের আবেগ ও চেতনা জাগ্রত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিগত বছরগুলোতে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহকে কেন্দ্র করে রচিত গানসমূহ প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হলে তা মানুষকে ব্যথিত করে ও নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়াতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তেমনি জয়নুল আবেদীনের দুর্ভিক্ষের উপর আঁকা ছবিসমূহ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষের আবেগকে জাগিয়ে তোলে।[৩১]

শিক্ষা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দের ভেদাভেদ শেখায় এবং তার পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ফলশ্রুতিতে মানুষের সামাজিক আচার আচরণ, রীতিনীতি সমাজ কাঙ্ক্ষিত পন্থায় গড়ে ওঠে।

ধর্ম

ধর্ম সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি ধর্মেরই সর্বজনীন আবেদন থাকে যা মানুষকে ন্যায়ের পথে এগিয়ে যেতে এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকতে উৎসাহ যোগায়। পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় সব ধর্মেই ইহজগতে সৎকর্মের মাধ্যমে পরজগতে অনন্ত সুখের ধারণা দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে অসৎকর্মের শাস্তিও বর্ণিত আছে। ফলে পরজগতে সুখের প্রত্যাশা ও শাস্তির ভয় মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত আচার আচরণ করতে অনুপ্রাণিত করে।[৩২]

বিবাহ

একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ মানুষের সামাজিক জীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যৌনতার মতো সহজাত প্রবৃত্তি এবং সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগগত আচরণ বিবাহের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে সমাজে ভারসাম্য টিকে থাকে।[৩৩]

রাজনৈতিক দল, মর্যাদাগোষ্ঠী এবং শ্রেণি

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবারের মতে গুরবিন্যাস সৃষ্টি হয় ক্ষমতার অসম বন্টনের ফলে। গুরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অসম বণ্টন আমরা লক্ষ্য করি তিনটি ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতার সরাসরি এবং রাজনৈতিক প্রকাশ দেখতে পাই। সমাজের পরিসদে সম্মান বা মর্যাদার যে অসম প্রকাশ তা বিরাজ করে মর্যাদাগোষ্ঠীর ভিতরে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে সম্পত্তির বিন্যাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠে শ্রেণি। বর্তমান বরেন্দ্র অঞ্চলে এ সকল প্রতিযোগিতার বিন্যাসই সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায়।

মর্যাদাগোষ্ঠী

সমাজে মানুষকে মর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি স্তরকে একটি মর্যাদাগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মর্যাদাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বিশেষ জীবন-রীতি Life Style। মর্যাদাগোষ্ঠীর সদস্যরা অন্য গোষ্ঠীর সাথে সামাজিক যোগাযোগ সীমাবদ্ধ রাখে। মর্যাদাগোষ্ঠী হচ্ছে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের স্তরবিন্যাসের রূপ। জাত-বর্ণ প্রথা বা মধ্যযুগে ইউরোপের এস্টেট ব্যবস্থা মর্যাদাগোষ্ঠীর প্রধান রূপ।[৩৪]

শ্রেণির সমকালীন চিন্তা

ভেবারের শ্রেণির ধারণা থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা একটি গভীর অর্ন্তদৃষ্টি পেয়েছিলেন। বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হলে মানুষের প্রয়োজন নানা ধরনের দক্ষতা এবং গুণ। আধুনিক সমাজে শিক্ষাগত এবং পেশাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা জীবন সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় এবং উঁচু আয়ের সুযোগ করে দেয়। ফলে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানীরা শ্রেণি বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করেছেন পেশা, শিক্ষা এবং আয় অথবা শুধু মাত্র পেশা। পেশা সাধারণত: শিক্ষা এবং আয়কে প্রতিফলিত করে।[৩৫]

শ্রমিক শ্রেণি

নিয়মিতভাবে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে শ্রমিক শ্রেণি। উঁচু শ্রমিক শ্রেণি Upper Working Class গড়ে উঠে দক্ষ শ্রমিকদের নিয়ে। তাদের আয় বেশি এবং চাকুরির নিরাপত্তা রয়েছে। নিচু শ্রমিক শ্রেণিতে রয়েছে অদক্ষ এবং আধাদক্ষ কর্মজীবীরা যাদের আয় কম এবং কাজের নিরাপত্তা কম।

সমাজকাঠামোর ধারণা ও উপাদান ব্যাখ্যা

সমাজবিজ্ঞানে সমাজকাঠামো মৌলিক প্রত্যয় হিসেবে বিবেচিত। সমাজকাঠামাকে ছাড়া সমাজের সামগ্রিক ধারণা তথা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। তাই বলা হয় সমাজকাঠামায়ে হল সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রতায়। সহজ ভাষায় সমাজকাঠামো হলো, যে ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। যারা প্রথম সমাজকাঠামোর ধারণা ব্যবহার করেন হার্বাট স্পেন্সার তাদের অন্যতম। তিনি সমাজকাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জৈব কাঠামো, বিবর্তন ইত্যাদি জীববিদ্যায় ব্যবহৃত ধারণার সাহায্য নেন।

পরবর্তীকালে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ সমাজকাঠামোর সংজ্ঞা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন কিন্তু তবুও এ বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইংরেজ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী র‌্যাডক্লিফ ব্রাউন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সর্ম্পককেই সমাজকাঠামোর অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন. "সমাজকাঠামোর পাঠের সময় আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছুসংখ্যক মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সূত্র হিসেবে বিদ্যমান প্রকৃত সম্পর্কের বাস্তব অবস্থাটিকে অনুধাবন করতে চাই।" অনেক সমাজবিজ্ঞানীই সমাজের কাঠামোগত রূপকে সমাজকাঠামো হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩৬]

অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী মরিস গিন্সবার্গ সমাজকাঠামো সমাজ অভ্যন্তরস্থ মুখ্য গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌগ হিসেবে দেখেছেন। তার এ সংজ্ঞায় বিমূর্ত সামাজিক সম্পর্ক ও তার সাথে সম্পর্কিত সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অস্ট্রিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানী এস এফ নাদেল সামাজিক ভূমিকার ধারণার ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজকাঠামোর একটি সীমিত সংজ্ঞা দেন। তার ভাষায়, "বাস্তব জনসমষ্টি ও তার আচরণ থেকে বিমূর্ত করে বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালনরত ব্যক্তির মধ্যে ভূমিকাগত পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিত্তিতে যে সম্পর্কের বিন্যাস অথবা ব্যবস্থা পাওয়া যায় সেটিই সমাজের কাঠামো।"[৩৭]

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারশন্স মনে করেন, সমাজব্যবস্থার কাঠামো সংস্কৃতির ধরনের দ্বারা গঠিত হয়। এই বোধ থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি সংস্কৃতির ধরনকে চারভাগে ভাগ করেন।[৩৮] যথা:

ক. ব্যক্তির ভূমিকা পালনের প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির থেকে যা আশা করা।

খ. সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বহুমুখী ভূমিকা তথা সমষ্টিবদ্ধ মানুষের ভূমিকা হিসেবে যেটি গড়ে উঠে।

গ. ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমাজে ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্বের ধরন এবং

ঘ. কোনো কিছুকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়ে তার প্রতি মানুষের অধিকার অর্থাৎ কাঠামোগত ক্রিয়াবাদ ব্যক্তির ভূমিকার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং যে সম্পর্কটি একটি মান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও একে অপরের প্রতি ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সমঝাতোর ভিত্তিতে যে নিয়ন্ত্রিত কাঠামো গড়ে ওঠে, তাকেই সমাজকাঠামো হিসেবে বোঝাতে চাইছে।

সমাজকাঠামোর উপাদান: সমাজকাঠামো সমাজের নানাবিধ উপাদান দ্বারা গঠিত। শেফারের মতে, সমাজ কাঠামোর উপাদানগুলো হলো মর্যাদা, সামাজিক ভূমিকা, গোষ্ঠী, সামাজিক নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সমাজকাঠামোর নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান উপাদান বিদ্যমান।

সামাজিক প্রাণি

সমাজকাঠামোর মৌলিক উপাদান সমাজ। আর সমাজ গঠিত হয় সকল মানুষ নিয়ে। সামাজিক মানুষ জন্মের পর পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে আচার আচরণ, রীতিনীতি আদর্শ- মুল্যবোধ শিক্ষা লাভ করে থাকে। সমাজ বহির্ভূত কোনো মানুষ নিয়ে সমাজকাঠামো অধ্যয়ন করে না। প্রত্যেক মানুষেরই একটা অবস্থান বা ভূমিকা আছে। আর মানুষের এ অবস্থানের জন্যই একে সামাজিক জীব বলা হয়। ব্যক্তির সামাজিক আচার আচরণ, ভূমিকা আদর্শ- মুল্যবোধ, মর্যাদা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান

সমাজ কতকগুলোর প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় স্বায়ী কিংবা অস্থায়ী হয়ে থাকে। স্বামী সংগঠনগুলো। সময়ের মানুষকে রক্ষা করার জন্য গড়ে ওঠে। এছাড়া মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্যও সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সমাজে কোনো ব্যক্তি যদি সমাজ বহির্ভূত কাজ করে তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে। সুতরাং মানুষের আদর্শ মূলাবোধ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন। আর এ সামাজিক সংগঠনই সমাজকাঠামোর অন্যতম প্রধান উপাদান।

সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ

আদর্শ ও মূলাবোধ সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সময়ের প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব কিছু আদর্শ-মূল্যবোধ ও রীতিনীতি থাকে। আবার সমাজেরও একটা নিজস্ব মূল্যবোধ বিদ্যমান থাকে । বাড়ি যেমন তার মূলাবোধ দ্বারা সমাজকে প্রভাবিত করে, তেমনি সমস্যাও ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে। তাই সমাজে টিকে থাকার জন্য মূল্যবোধের প্রয়োজন।

উপসংহার

সমাজে বিভিন্ন মত-পথের সমন্বয়ে পরিচালিক হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। বাংলাদেশেও এর বাইরে নয়। সমৃদ্ধ ও প্রাচুর্যপূর্ণ এ সোনালী ও রুপালী বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে অর্থনৈতিক, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে একাধারে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আলপাইন, আর্য, শক, মোঙ্গলীয়, আরবীয় ও তুর্কি, হাবসি, আফগানি, সুর, বারভূঁইয়া, সুতলানী, মুঘল এবং ইউরোপীয় রক্তধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। বহু রক্তধারার সংমিশ্রণে বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র আসে। প্রাচীন বাংলার বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদ বৌদ্ধ ও সেন যুগ রাজনৈতিক ঐক্যের দিকে ধাবিত হয়। মুসলমানদের আগমনের পর সুলতানি আমলের পূর্বের স্বাধীন জনপদগুলো নিয়ে বাংলার কেন্দ্রীয় শাসন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। ফলে দিল্লির মোগল শাসনাধীনে বাংলার সুবাদার ও দেওয়ানের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালিত হতে থাকে। দীর্ঘ বছর তাদের দ্বারা অত্র অঞ্চল শাসিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে আমাদের গর্বিত প্রাচীন বাংলার আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, কুচবিহার ও কলিকাতাকে হারিয়ে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম ছোট একটি দেশ বাংলাদেশ।

তথ্যনির্দেশ

১ A. Cunningham, *Archeological Survey of India*, vol. XV, (Calcutta: 1882), pp. p.115.

২ H. Blackman, 'The History and Geographical Area of Bengal,' *Journal of the Asiatic society of Bengal*, part-1 (Dhaka: 1875), p. 211.

৩ *Ibid*, p. 212.

৪ A. Cunningham, *op.cit*, p. 116.

৫ Minhaj al-Din Siraj, *Tabaqat-i-Nasira*, Vol-I, Reprinted (New Delhi: 1970), p. 585. (Footnote).

৬ A.K.M. Yaqub Ali, Barind in the Hisroty of Muslim Bengal, Journal of the Pakistan Historical Socity, (Karachi: 1968), pp- 81-82.

৭ শ্রী সুখমায় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছরঃ স্বাধীন সুলতানী আমল* (কলিকাতা: ভারতী বুক স্টল, ১৯৬৬), পৃ. ৫৫৯।

৮ সন্ধ্যাকর নন্দী, *রাম চরিতম* (রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্স সোসাইটি, ১৯৩৯), পৃ. ৭৫।

৯ Minhaj al-Din Siraj, *op, cit*, pp. 585-586(Footnote).

১০ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১৭; আবদুল মতিন চৌধুরী, 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়', আনিসুজ্জামন সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১।

১১ A. Cunningham, *op. cit*, p. 125.

১২ নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪৫।

১৩ সন্ধ্যাকর নন্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৩।

১৪ নিহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫; R.C. Majumder (ed.), *The History of Bengal*, vol-I. (Dacca:1963), p. 20.

১৫ নিহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫; A.K. Maitra, *op. cit*, p: Introduction, 1.

১৬ রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (কলিকাত: ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৩৪।

১৭ A. Cunningham, *op. cit*, p.115.

১৮ *Ibid*, p. 212.

১৯ *Ibid*, p. 116.

২০ Minhaj al-Din Siraj, *Tabaqat-i-Nasira*, Vol-I, Reprinted (New Delhi: 1970), p. 585. (Footnote).

২১ A.K.M. Yaqub Ali, Barind in the Hisroty of Muslim Bengal, Journal of the Pakistan Historical Socity, (Karachi: 1968), pp- 81-82.

২২ শ্রী সুখমায় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছরঃ স্বাধীন সুলতানী আমল* (কলিকাতা: ভারতী বুক স্টল, ১৯৬৬), পৃ. ৫৫৯।

২৩ সন্ধ্যাকর নন্দী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

২৪ Minhaj al-Din Siraj, *op, cit*, pp. 585-586(Footnote).

২৫ ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১৭; আবদুল মতিন চৌধুরী, 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়', আনিসুজ্জামন সম্পাদিত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১।

২৬ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, 'বরেন্দ্রভূমির চিরায়ত বাসিন্দা নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান', সাইফুদ্দিন চৌধুরী সম্পাদিত, *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস* (রাজশাহী: বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮), পৃ. ৯৫।

২৭ নীরাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।

২৮ মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত* (কলিকাত: আনন্দ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৫), পৃ. ১৭।

২৯ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *বরেন্দ্র অঞ্চলের মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য*,(ঢাকা: প্রথম প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ২২।

[৩০] রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারত*, অনুবাদ সুমন পট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪), পৃ. ৮৯।

[৩১] Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Unpublished Ph.D Thesis), (Varanasi, 1984), pp. 54-58.

[৩২] *Archaeological Survey of India*, Annual Repart, (Delhi: 1929), p. 3.

[৩৩] রামরাই পণ্ডিত, *শূন্য পুরাণ*, সম্পাদনা নগেন্দ্রনাথ বসু (কলিকাত: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪।

[৩৪] ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর* (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ১।

[৩৫] *তদেব*, পৃ. ১০১-১০২, প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা* (প্রাচীন যুগ-১২০৬ খ্রি. পর্যন্ত) (কলিকাতা: শ্রীধর প্রকাশনা, ১৯৯১), পৃ. ৩১৭-৩২০।

[৩৬] ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১২।

[৩৭] *তদেব*, পৃ. ১১৩-১১৪।

[৩৮] *তদেব*, পৃ. ১১৫-১১৬।